প্রতি গ্রামে হোক একটি পাঠাগার

আবদুস ছাত্তার খান

বৃহৎ মঙ্গলের জন্য সমষ্টিকে নিয়ে কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার নামই আন্দোলন। বাংলার বেশির ভাগ মানুষের বাস গ্রামে। আর এই গ্রামের মানুষেরাই আমাদের উৎপাদক শ্রেণি। কিন্তু আমাদের সমাজে এই উৎপাদক শ্রেণিই আজকে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত ও অবহেলিত। তাদেরকে এই বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দিতে বাইরে থেকে ধার করে আনা কিংবা চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়ন মডেলে সম্ভব নয়, সেটি আজ স্পষ্ট। অপর দিকে শহরের মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা, বিলাসিতা, সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বা পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ক্রমেই বাড়ছে। সে কারণে আমাদের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো কোনো দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ হিসেবে আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কারণকে মোটা দাগে চিহ্নিত করতে পারি। যা রোগের মতো আমাদের সমাজে ছড়াচ্ছে, অথচ পরম আদরের সাথে তাকেই আমরা লালন করছি। আত্মবিলাসি এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে এসে সমষ্টিকে নিয়ে বৃহৎ-এর মাঝে নিজেকে যুক্ত করে সকলের মঙ্গলের জন্যই চাই এক বৃহৎ আন্দোলন। আমরা তার নাম দিতে চাই 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'।

যেভাবে শুরু

২০০৬ সালে ৭ জন মিলে শুরু করি অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগারের কার্যক্রম। পরে যোগ দেন আরো অনেকে। এরই মাঝে বর্ষা মৌসুমে শুরু হয় যমুনার ভাঙ্গন। ঘর বাড়ি ভেঙ্গে অনেক মানুষ যেমন হয় সহায় সম্বলহীন তেমনি অনেক কৃষকের আবাদি জমিও যায় পানির তলায়। তাদের জন্যে কিছু একটা করতে মন চাচ্ছিল । ঢাকার একটা ভ্রমণ দলের (বিটিইএফ) সাথে যোগাযোগ ছিল। তারা কিছু করতে চায় এই অসহায় মানুষগুলোর জন্য। আমাদের এলাকা বন্যা কবলিত বিধায় তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। প্রথমে তারা চিড়া, গুড়মুড়ি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে চায়। আমরা তাদের বলি আপনাদের উদ্যোগটা মহতী এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের এলাকার এ ধরণের সাহায্য মানুষের কোন উপকারে আসবে না। তার চেয়ে যদি বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে সহায়তা করেন তাহলে গ্রামের মানুষের অনেক উপকারে আসবে। তারা এতে রাজি হন।

পরে আমি আমার নিকট আত্মীয় দুইজনের সাহায্য চাই। তাদের বলি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তালিকা করে দিতে। তারা একটা তালিকা করে । এতে বেশির ভাগ ছিল একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নাম। যেটা আমারা আশা করিনি। পরে পাঠাগারের সদস্যরা রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা করে। এখানে একটা অভিজ্ঞতা হয়, তরুণরা অপেক্ষাকৃত নির্মোহভাবে কাজ করতে পারে।

টাকার পরিমাণ ছিল পঞ্চান্ন হাজার। আমার মত ছিল প্রতি পরিবারকে ১০০০ করে টাকা দিতে। কিন্তু তালিকায় অনেকের নাম থাকায় আমরা সমস্যায় পড়ে যাই। পরে এক সদস্য

গবেষনা করে বের করেন আমারা যদি ৫০০ টাকা করে দেই তাহলে ১১০টি পরিবারকে আমরা সহযোগিতা করতে পারবো এবং এ টাকা তাদের কাজেও আসবে। যেমন তখন বাজারদর অনুযায়ী ৩০০ টাকায় ৫ কেজি জালা (ধানের চারা গাছের স্থানীয় নাম) পাওয়া যেত। যা থেকে ৮/১০ মণ ধান পাওয়া সম্ভব হবে। ৪ সদস্যের একটি পরিবার যা দিয়ে অনায়েসে ১ মাস চালিয়ে নিতে পারবে। বাকি ২০০ টাকা সার ও জমি পরিচর্যার কাজে লাগবে।

আমাদের কঠিন শর্ত ছিল এ টাকা দিয়ে অবশ্যই কৃষি কাজ করতে হবে। পাঠাগারের সদস্যরা এ ব্যাপারে নজরও রাখে। প্রায় ৮০ভাগ লোক এ টাকার সঠিক ব্যবহার করেন আর বাকি ২০ ভাগ লোক আর্থিক অনটনের কারণে ঐ টাকা অন্য খাতে খরচ করে ফেলেন। ফসল উঠার পরে তারা নিজেরাই বলেছিল, তারা গড়ে ১০ মণ করে ধান পেয়েছিল। আর ঐ ধান থেকে যে খড় হয়েছিল তার মূল্যই হবে প্রায় ৫০০ টাকা।

২০০৭ সালে সিডর আঘাত হানে বিস্তীর্ণ দক্ষিণ অঞ্চলে। পাঠাগারের পক্ষ থেকে আমরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেই। সদস্যরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ৩০০০ টাকা ও ৫ মণ চাল উঠায়। কিন্তু বিপদ হয় এগুলো আমারা পাঠাবো কি ভাবে। পরে উপজেলা কর্মকর্তার সাথে কথা বলে সরকারের ত্রাণ তহবিলে জমা দিই। কিন্তু মনে সন্দেহ জাগে এগুলো যথাসময়ে যথাযথ লোকের কাছে পৌঁছবে কিনা?

তখন আমাদের মাথায় আসে যদি ঐ এলাকায় আমাদের পাঠাগারের মতো একটা সংগঠন থাকতো আর তাদের সাথে যদি আমাদের যোগাযোগ থাকতো তাহলে এই সামান্য কটা জিনিসই এই বিপদের দিনে কত না কাজে আসতো। আমাদের এই ভাবনা শেয়ার করি ঢাকার রর‍্যমন পাবলিকেশনের রাজন ভাইয়ের সাথে। ওনি আমাদেরকে আশ্বাস দেন। বলেন যত বই লাগবে নিয়ে যাবেন লজ্জা করবেন্ না। পরে আমরা লেগে যাই নানা জায়গায় পাঠাগার দেয়ার কাজে। কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, নাটোর, বদলগাছি, মধুপুর, সখিপুর, ভূঞাপুরসহ নানা জায়গায় আমাদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে থাকে পাঠাগার। বিছিন্নভাবে যে পাঠাগারগুলো গড়ে উঠছে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকি। খাগড়াছড়ির অরং পাঠাগার এ রকম একটি পাঠাগার। আমারা যুথবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নাম নেই 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'।

পাঠাগারগুলো গড়ে উঠে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে। এলাকার প্রয়োজন, চাহিদা, ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে স্থানীয়রাই সিদ্ধান্ত নেন কী হবে তাদের কর্ম পরিকল্পনা। কেমন হবে তাদের কার্যপদ্ধতি। যেমন জেলা ও থানা পর্যায়ে সাধারণ পাঠাগার থাকায় সেখানে পাঠাগারগুলো হয় বিশেষ ধরনের পাঠাগার। এরকমই একটি পাঠাগার হলো লাইসিয়াম গণিত ও বিজ্ঞান সংঘ। যেখানে আয়োজন করা হয় বিজ্ঞানের নানা সেমিনার, কর্মশালা, ম্যাথ অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞানমেলা এমনই নানা ধরনের আয়োজন।

সমস্যা যেমন সমাধানও তেমন

বাংলাদেশ সমতল ভূমির দেশ হলেও সর্বত্র এর ভূমিচিত্র এক নয়। ফলে দেশের এক অঞ্চলের সমস্যা বা সম্ভাবনার সাথে অন্য অঞ্চলের সমস্যা বা সম্ভাবনার রয়েছে বিস্তর

তফাৎ। যেমন যমুনার বিস্তীর্ণ চর এলাকার মানুষের যে জীবনযাত্রা, তারা প্রতিনিয়ত যে ধরনের সমস্যা বা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয় এবং এর থেকে উত্তরণে তাদের যে অভিজ্ঞতা তার সাথে কোনো মিল নেই বরেন্দ্র এলাকার মানুষের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সাথে বা তা থেকে উত্তরণ কৌশলের। তেমনি সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণাঞ্চলের সাথে হাওর বা পাহাড়ি এলাকার মানুষেরও সমস্যা বা সম্ভাবনাগুলোও এক নয়। অঞ্চলভেদে দেশের সমস্যাগুলো যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি তা থেকে উত্তরণের কৌশলও হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন। হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশের ভূমিপুত্ররা যেভাবে নিজেদের টিকিয়ে রাখার কৌশল উদ্ভাবন করেছে তার সাথে মেলবন্ধন ঘটাতে হবে আগামীর উন্নয়ন চিন্তাকে। কিন্তু কোনো ক্রমেই চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ অনুপ্রবেশকারী যতটুকু শৃঙ্খলা আনে তারচেয়ে বিশৃঙ্খলতাই তৈরি করে বেশি।

আমরাও দিতে পারি একটি পাঠাগার

অনেকেই প্রশ্ন করেন পাঠাগার দিতে পয়সা লাগে, জমি লাগে এসব আমরা পাবো কোথায়? হ্যা লাগে কিন্তু তার চেয়েও যেটা বেশি লাগে সেটা হলো ইচ্ছা শক্তি আর আন্ত:রিকতা। একটা পাঠাগার স্থাপনের প্রথম যা দরকার তা হলো সমমনাদের যুথবদ্ধতা। তারপর নিজেদের কাছে যে বইগুলো আছে তা একত্রিত করা। বিদ্যালয় বা করো বাড়ির পড়ার ঘরটাই হতে পারে পাঠাগার। সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য থাকতে হবে একটি কমিটি। বন্ধুরা এইতো হয়ে গেল একটি পাঠাগার। দেখেন এতোটুকু করতে আমাদের কতো টাকা লাগবে। তারপর যদি গ্রামবাসীর কাছে যান একটি করে বই কেনার টাকা (ধরেন ১০০টা)চান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা ১০০ জনের নিকট দাবি করলে ২০ জন লোক অবশ্যই আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। তারপর ঈদ, পূজা-পার্বনে যখন গ্রামের কর্মজীবীরা গ্রামে আসবে তাদের নিকট গিয়েও যদি অনুরোধ করেন আমার মনে হয় সবাই আপনাদের হতাশ করবে না। মনে রাখবেন পাঠাগার একটি চলমান প্রক্রিয়া। এখানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বই সংযোযিত হবে। আর এভাবেই যদি আপনে লেগে থাকেন কয়েক বছর পর দেখবেন আপনাদের দেয়া এই পাঠাগারটিই আলো ছড়াচ্ছে আপনার গ্রামে।

আমরাও পারি এই আন্দোলনে যোগ দিতে

গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের মূল দর্শন হলো সমষ্টির মুক্তির ভিতরেই ব্যক্তির মুক্তি। আপনে যখন আপনার গ্রামের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য সমমনাদের নিয়ে একটা পাঠাগার স্থাপন করবেন তখনই যুক্ত হবেন এই আন্দোলনের সাথে। গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে ধরা বাধা কোন নিয়ম নেই ।গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন যেহেতু একটা চেতনার নাম তাই এর নেই কোন তথাকথিত সাংগঠনিক কমিটি, নেই কোন সংবিধান। কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তির সহযোগিতায় আমরা যুক্ত হতে পারি অতি সহজেই। বলতে পারেন ফেইসবুকে গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন নামের যে পেইজ আছে তাই হচ্ছে আমাদের কার্যালয়। এখনেই আমরা যে কোন সময় যে কোন বিষয় নিয়ে করতে পারি মিটিং, করতে পারি আমাদের ভালো কাজের প্রচারণা। বিনে সুতায় আমরা যুক্ত হতে পারি একে অপরের সাথে। দাড়াতে পারি একজন আরেকজনের আপদে-বিপদে।

থাকবে বাধা অনেক :

কেউ ভাববেন না আপনে বললেন আর গ্রামের সকলেই রাজি হয়ে যাবে। বরং উল্টোটাও হতে পারে। আপনে সহজেই হতে পারেন তাদের মসকরার লক্ষ্যবস্তু। কেউ কেউ আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে ু পাবনা থেকে ঘুরে আসতে। সবকিছু অপেক্ষা করে যদি আপনে শুরু করেন তবুও আপনে আপনার পাশে কিছু লোক পাবেন। তখন আপনে হবেন তাদের ইর্ষার বস্তু। নানা ধরণের অপপ্রচার ছড়াবে তারা আপনার বিরুদ্ধে। আপনে বাইরে থেকে কারি কারি টাকা নিয়ে আসছেন, আপনে মেম্বার চেয়ারম্যানে দাড়াবার মতলব করছেন। আপনার পরিকল্পনাকে ভণ্ডুল করবার জন্য স্থানীয় রাজনীতিবীদ ও প্রশাসন পদে পদে আপনাকে বাধার সৃষ্টি করবে। তখন আমাদের একটিই কথা ু ' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে'। আরো বাংলায় বললে দাঁতে কামড় দিয়ে পড়ে থাকেন।

বর্তমান অবস্থা :

২০০৬ সালে অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে শুরু হয় গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের কার্যক্রম। আজ প্রায় ১৬ বছর পরে গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের দর্শন বিশ্বাস করে এ রকম পাঠাগারের সংখ্যা ৭০ টি । আরো শত শত পাঠাগারের সাথে রয়েছে আমাদের যোগাযোগ। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি কলেজে ২টি প্রাইমারি স্কুল। গ্রামীণ পর্যটন শিল্পকে বিকাশ করার জন্য অর্জুনাতে শুরু হয়েছে 'গ্রামে ঘুড়ি'র কাজ। গত ৫ বছরে প্রায় শত শত পর্যটক ঘুরে গেছে টাঙ্গাইলের প্রত্যান্ত গ্রাম অর্জুনায়। উপভোগ করেছে যমুনা পাড়ের অর্জুনা গ্রামের সৈন্দর্য। যাত্রীদের দূর্ভোগ লাঘবের জন্য নির্মিত হয়োছলো একটি যাত্রী ছাউনী । ২০০৬ সাল থেকে টাঙ্গাইলের অর্জুনা গ্রামে হয়ে আসছে বইমেলা। গ্রামবাসী এখন চাতক পাখীর মতো অপেক্ষায় থাকে কবে আসবে ফেব্রুয়ারি মাস, কবে শুরু হবে মেলা? এই বইমেলা যেন গ্রামবাসীর মিলনমেলা। যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা এই সময়ই বাপের বাড়ি আসে, আর ছেলেরা যারা চাকরি করে তারা এই সময়টাতেই বাড়িতে আসে। ফলে মেলাটা যেন আরেকটা ঈদ উৎসব গ্রামবাসীর কাছে।

আমাদের স্বপ্ন , আমাদের কলেজ

গ্রামের মানুষের দির্ঘদিনের স্বপ্ন ছিলো গ্রামে একটি কলেজ হবে। বারবার নদী ভাঙ্গনের শিকার গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ ছিলো না কলেজ স্থপনের । তাছাড়া গ্রামে কোন শিল্পপতি, আমলা বা জনপ্রতিনিধি নেই যারা সাহস দিতে পারে এই কলেজ স্থাপনের । আমরা অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগার থেকে ২০১৩ সালে ঘোষণা দেই আমাদের গ্রামে আমরা একটি কলেজ স্থাপন করবোই । গ্রামের সভ্রান্ত হাজীবাড়ির লোকেরা কলেজের জন্য জমি দিতে আগ্রহী হয়। আমরাও উঠে-পড়ে লেগে লেগাম। সালটি ছিলো কবি গুরুর নোবেল প্রাপ্তীর শতবছর পূর্তি। তাই আমরা সিধান্ত নিলাম ২০১৩ সালেই ডিসেম্বর মাসে আমরা কলেজ স্থপন করবো । পাঠাগারের সদস্য ও গ্রামের যুব সমাজ নিজেরা মাটি কেটে দিলো ।

ফেইসবুকের বন্ধুদের নিক থেকে পেলাম অকুণ্ঠ সমর্থন। কেউ অনুদান , কেউ ধার দিয়ে আমাদের স্বপ্ন কে দাড় কঁরিয়ে দিলো । প্রথম থেকে অন্য কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকলেও ২০১৮ সালে কলেজটি কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে থেকে পাঠদানের অনুমতি পায়। করনার ধকর পেরিয়ে কলেজ থেকে বের হয়ে গেছে প্রথম ব্যাচ। দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা আগামী নভেম্বরে।
কলেজে রয়েছে ১৫০ প্রজাতির ফলদ, ভেষজ, বনজ বৃক্ষের বাগান, ১০টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ একটি আধুনিক ল্যাব। যেখনে গ্রামের তরুণ তুরণীরা পাচ্ছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।

আগামীর পরিকল্পনা :
আমরা স্বপ্ন দেখি গ্রামে গ্রামে পাঠাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিনে সুতায় একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে, আপদে-বিপদে একজন আরেকজনের পাশে দাড়াতে, নিজেদের ইতিহাস-সংস্কৃতি রক্ষায় নিজেদের ভূমিকা রাখতে। তাই আমাদের পরিকল্পনা হলো আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নের কোন না কোন গ্রামে একটি করে পাঠাগার স্থাপিত হবে।
গ্রামে গ্রামে পাঠাগার করতে গিয়ে আমরা যে জিনিসটার অভাব চরমভাবে লক্ষ্য করেছি তা হলো শিশু-কিশোরদের মান সম্পন্ন বইয়ের খুব অভাব। অথচ গ্রামের পাঠাগারের পাঠকই হলেন এই শিশু কিশোররা । কারণ মোটামুটি এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর হয় উচ্চ শিক্ষা না হয় চারকরির খোঁজে তাদরে গ্রামের বাইরে চলে আসতে হয়ে। ফলে এই শিশু-কিশোররাই হলো তাদের মূল পাঠক। কিন্তু মা সম্পন্ন বইয়ের অভাবে বা তাদের বইয়ের অতি উচ্চ মূল্যের কারণে পাঠাগারের সংগঠকদের চাহিদা মতো বই সংগ্রহ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে তারা পাঠকও টানতে পাচ্ছে না । পরে একটা সময় দেখা যায় অনেক সংগঠকই আর পাঠাগার চালাতে পাচ্ছে না । তাই আমরা সিধান্ত নিয়েছি ডিসেম্বরে পাঠাগার সম্মেরনের আগে আমরা একটা প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলবো । সেখান থেকে না লাভ, না লোকশান এই নীতির ভিত্তিতে সুলভ মূল্যে মানসম্পন্ন বই প্রকাশ করবো ।

সারা দেশের পাঠাগার সংগঠক ও পাঠাগার সুহৃদদের মধ্যে আন্ত:যোগযোগ স্থাপন, পাঠাগারের সমস্যা, সম্ভাবনা, প্রতিকূলতা , তা থেকে উত্তরণের উপায় ইত্যাদি নান বিষয় নিয়ে আগামী ডিসেম্বরে ভূঞাপুরের অর্জুনা গ্রামে আমাদের স্বপ্নের কলেজ প্রাঙ্গনে তিনদিনব্যাপী আবাসিক পাঠাগার সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছি। আশা করি এই সম্মেরনের পর সারা বাংলাদেশে পাঠাগার সংগঠকদের মঝে একটা প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি হবে।

গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের ঘোষণা
আমরা আমাদের অবস্থান দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি। গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন শুধু পাঠক তৈরির আন্দোলন নয়। পাঠক যেমন তৈরি হবে একই সাথে তারা হবে সমাজমনস্ক। গ্রামের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা। তারপর সকলকে নিয়ে স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে সবচেয়ে সস্তায়, সহজ বিকল্প উপায়ে অতিদ্রুত তার সমাধান করা। কোনোভাবেই সরকার বা অন্য কোনো

সংগঠনের দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না। যেমন দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে মাঝে মাঝে বাঁধ ভেঙ্গে লোনা পানি আবাদি জমিতে ঢুকে পড়ে। এতে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। যদি দ্রুত বাঁধ মেরামত করা না হয় তবে প্রতিদিন জোয়ারের পানি প্রবেশ করে এবং জমির লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেয়। ফলে জমির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হয়। কিন্তু এ সময়ই যদি একদল উদ্যোগী মানুষ একত্রিত হয়ে গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে বাঁধ মেরামতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তা অতি সহজে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প শ্রমেই দ্রুত মেরামত করা সম্ভব। যা আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন দৈনিকে সচিত্র প্রতিবেদন আকারে দেখতে পাই। এখন আমরা ঐ স্বল্প অথচ সংঘবদ্ধ মানুষগুলোর নিরন্তর প্রচেষ্টাকেই আমরা নাম দিতে চাই 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'। কারণ ঐ মানুষগুলোর কাছে পুরো গ্রামটাই একটা পাঠাগার। গ্রামের মানুষগুলো হলো বই। আর কলম হলো গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ। যা দিয়ে সে রচনা করতে পারে গীতাঞ্জলির মতো এক একটা গীতাঞ্চল।

বন্ধু তুমি পাশে থেক

আপনেও হতে পারেন আমাদের স্বপ্নের সারথী। বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা পাঠাগারগুলোতে বই দিয়ে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে, আমাদের স্বপ্নের কলেজের পাশে দাড়িয়ে, এই আন্দোলনের কথা প্রচার প্রচারণা চালিয়ে আপনেও হতে পারেন আমাদের আন্দোলন কর্মী।